যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে নবী-রসূল ও মু'মিনগণের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাতে মুসলমানগণকে অনেকটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে, যাদের মনে কাফিরদের উপহাসে কষ্ট হতো। বলা হয়েছে যে, এ বিরুদ্ধাচরণ তোমাদের সাথে নতুন নয় ; সব সময়ই চলে আসছে। পরবর্তী আয়াতে কাফিরদের দ্বারা নবী-রসূল ও মু'মিনগণকে কষ্ট দেওয়ার কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, এতেও তেমনিভাবে মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিররা তোমাদেরকে নানাভাবে উৎপীড়ন করবে, তাতে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি তো পরকালের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(দ্বিতীয় কথা হচ্ছে) তোমাদের কি এ ধারণা যে (সাধ্য-সাধনা ছাড়াই) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে ? অথচ (এখন পর্যন্ত তো কোন সাধনাই করনি। কেননা) এখনও তোমরা সেসমস্ত (মুসলমান) লোকের মত সমস্যার সম্মুখীন হওনি, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের উপর (বিরুদ্ধাচারীদের দ্বারা) এমন সব সমস্যা ও বিপদ আপতিত হতো। (যে বিপদের কারণে) তারা এমনকি নবী-রসূলগণ পর্যন্ত আতংকে কম্পমান হয়ে উঠতেন এবং বলাবলি করতেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে! (প্রতি-উত্তরে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হতো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য (অতি) নিকটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে ; এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মু'মিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা---যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل -

অর্থাৎ সবচাইতে অধিক বালা-মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবী-রসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীগণের প্রার্থনা যে, "আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে" তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেন নি। অতএব এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

(২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও—যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতামাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনের জন্য, এতিম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎ কাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মানুষ আপনার কাছে জানতে চায়, (সওয়াবের জন্য) কি জিনিস ব্যয় করবে (এবং কিভাবে ব্যয় করবে)? আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, যেসব বস্তু তোমরা খরচ করতে চাও, (তার নির্ধারণের বিষয়টি তো তোমাদের সৎ সাহসের ওপরেই নির্ভরশীল। তবে খরচ করার স্থানগুলো আমি বলে দিচ্ছি। তা হলো এই যে) তাতে অধিকার রয়েছে মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহারা এতীম শিশুদের, অনাথ-অসহায় ও মুসাফিরদের, আর তোমরা যা কিছু নেক কাজ করবে (চাই তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কোন স্থানে) সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত (এতে তিনি নেকী দান করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র আদর্শের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ কর। এখান

থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানমাল কোরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জানমাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রসূল (সা)-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন শরীফে রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ—এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রসূল (সা) দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূতে শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি হচ্ছে সূরা বাক্কারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে। এ ছাড়া সূরা আ'রাফে দুটি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা-হা ও সূরা নাযেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল—যার উত্তর কোরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি ; ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযুরে আকরাম (সা)-এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ—অর্থাৎ মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই রুকুতে দুটি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ—কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য

বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল হচ্ছে এই যে, আমর ইবনে নূহ রসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ مَاذَا يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَيْنَ نَضَعُهَا

অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব ? ইবনে জরীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে ? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা ?

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে-নযুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়-কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই ; কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব ? এ প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব'---এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ -

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর, তার হকদার হচ্ছে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরগণ।

আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইরশাদ করা হয়েছে وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ অর্থাৎ 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।' বাক্যটিতে ভাল ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয়তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব ? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো ? এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ قُلِ الْعَفْوَ—অর্থাৎ "আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।" এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কিত কয়েকটি মাস'আলা অবহিত হওয়া গেল।

মাস'আলা ১ ঃ এ দু'টি আয়াত ফরয যাকাত সম্পর্কিত নয়। কেননা, ফরয যাকাতের বেলায় নেসাব বা পরিমাণ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে তাও নির্ধারিত রয়েছে। রসূল (সা)-এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সেই হিসাব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে নেসাব ও ব্যয়ের পরিমাণ কোনটিরই উল্লেখ নাই। তবে বোঝা যায় যে, আয়াত দু'টি নফল সদকা সম্পর্কিত। এতে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাপক হিসাবে পিতামাতাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ মাতা-পিতাকে যাকাতের মাল দেওয়া রসূল (সা)-এর শিক্ষা মতে জায়েয নয়। এ কারণেই এ আয়াতের সম্পর্ক ফরয যাকাতের সঙ্গে নয়।

মাস'আলা ২ ঃ এতে আরো বোঝা গেল যে, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে যা দেওয়া হয় বা আহার করানো হয় তাতেও যদি আল্লাহ্‌র আদেশ পালনেরই উদ্দেশ্য থাকে, তবে সওয়াব তো পাওয়া যাবেই, তদুপরি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার শামিল হবে।

মাস'আলা ৩ ঃ এতে আরো বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে, তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে হযরত আবু যর গিফারী (রা) ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের যাকাত ইত্যাদি প্রদান করার পর যা থাকবে, তা নিজের হাতে জমা করে রাখা জায়েয নয়, সব দান করে দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী ইমামগণের মতে কোরআনের আলোচ্য এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা ব্যয় করতে হয়, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছুই থাকবে, তার সবই দান করে ফেলা ওয়াজিব নয়। সাহাবীগণের আমল দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ
صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ
دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না!

(২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ! আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ! আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা

সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্রয়োদশ নির্দেশ ঃ জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত ঃ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয করা হল এবং তা তোমাদের জন্য (স্বভাবত) ভারী (মনে) হবে। (পক্ষান্তরে) তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে। আর এমনও (তো) সম্ভব যে, তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে কর (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং (প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত অবস্থা) আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু তোমরা (পুরোপুরি) জান না। (সুতরাং ভালমন্দের মীমাংসা তোমরা স্বীয় পছন্দমত করো না। যা আল্লাহ্‌র আদেশ তাতেই মঙ্গল মনে করে কাজ করতে থাক।)

চতুর্দশ নির্দেশ ঃ সম্মানিত মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঃ রসূল (সা)-এর কয়েকজন সাহাবা কোন এক সফরে ঘটনাচক্রে কাফিরদের সাথে একটি খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সে যুদ্ধে একজন কাফির নিহত হয়। দিনটি ছিল রজব চাঁদের পহেলা তারিখ। কিন্তু সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে, সেদিন জমাদিউস্‌সানীর ত্রিশ তারিখ। যেহেতু ঘটনাটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হয়েছিল, তাই কাফিররা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, মুলমানেরা নিষিদ্ধ মাসের সম্মান পর্যন্ত করে না। তাতে মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। কোন কোন বর্ণনাতে আছে যে, কাফিররা উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ জানালে তারই উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। আপনি উত্তরে বলে দিন যে, এ মাসে (বিশেষভাবে ইচ্ছাপূর্বকভাবে) লড়াই করা বড়ই অন্যায়। (কিন্তু মুসলমানগণ এ কাজ ইচ্ছাপূর্বক করেনি, তারিখ সম্পর্কে খোঁজ-খবর না রাখার দরুনই তা হয়েছে। এটি হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব। অভিযোগাত্মক উত্তর হচ্ছে এই যে, কাফির ও মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানগণের উপর প্রশ্ন করার কোন সুযোগই ছিল না, যদিও নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা মারাত্মক অপরাধ কিন্তু কাফিরদের সে কার্যপদ্ধতি) আল্লাহ্‌র পথ (ধর্ম) হতে (মানুষকে) বিরত রাখা (ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাদেরকে কষ্ট

দেওয়া, যাতে ভয়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে ;) আল্লাহ্‌র সাথে নাফরমানী করা এবং মসজিদুল-হারাম যিয়ারত থেকে বঞ্চিত রাখা, (এর সাথে বেআদবী করা, সেখানে তখন মূর্তিপূজা ও সেসবের তওয়াফ করা হতো।) আর যারা মসজিদুল-হারামের যোগ্য পাত্র ছিল (অর্থাৎ রসূল এবং অন্যান্য মু'মিন) তাদেরকে (উত্যক্ত করে) সেই মসজিদুল-হারামের প্রতিবেশ থেকে বের হতে বাধ্য করা (যার ফলে হিজরত বা দেশত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল ; এসব কাজ নিষিদ্ধ মাসে নরহত্যার চাইতেও জঘন্য,) আল্লাহ্‌র নিকট মহা অন্যায়। (কেননা, এসব কাজ সত্য ধর্মে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্যই করা হয়। এবং এরূপ) বিভেদ সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও (যা মুসলমানদের দ্বারা হয়ে গেছে) অনেক বেশী (এবং মন্দ-কর্মের দিক দিয়ে) বড় দোষ ও পাপ। (কেননা, এ হত্যা দ্বারা সত্য ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি। বেশীর চাইতে বেশী জেনে-শুনে এমন কাজ করলে সে নিজে পাপী হবে। কিন্তু কাফিরদের কার্যকলাপে সত্য ধর্মের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়ে যায়। এবং) কাফিররা সর্বদা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে। এই উদ্দেশ্যে যে, যদি (খোদা না করুন) তোমাদের উপর কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে, তবে (তোমাদেরকে) এই ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে (তাদের এ কার্য-কলাপে ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপই প্রকাশ পায়)।

মুরতাদ হওয়ার পরিণাম ঃ আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যাবে এবং পরে কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে, এসব মানুষের (নেক) আমল ইহকাল ও পরকাল সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে যাবে। (এবং) তারা চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

(নিষিদ্ধ মাসে হত্যার দরুন মুসলমানগণের পাপ না হওয়ার কথা শুনে স্বস্তি-বোধ করলেও তাঁরা এই ভেবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, সওয়াব তো হলো না। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হলো)।

নিয়তের অকৃত্রিমতার জন্যে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি ঃ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা তো আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখে। (তোমাদের মধ্যেও তো এ আশা রয়েছে। ঈমান এবং হিজরতের সওয়াব তো সুনির্দিষ্ট, তবে এই বিশেষ জিহাদের বেলায় সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং তোমাদের নিয়ত যেহেতু জিহাদেরই ছিল, তাই আমার নিকট তাও জিহাদের মধ্যেই শামিল। তাহলে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের নৈরাশ্য কেন ?) আর আল্লাহ্ তা'আলা (এ ভুল) ক্ষমা করবেন এবং (ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের দরুন তোমাদের উপর) রহমত করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিহাদের কয়েকটি বিধান

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্ন-লিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ-"তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো।" এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসূল (সা)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে আইন-রূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না; বরং এটা ফরযে কিফায়াহ্। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الجهاد ماض الى يوم القيامة--এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً - وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى -

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা জান এবং মাল দ্বারা জিহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জন-কারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্য বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ -

অর্থাৎ "কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেলো না।" এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জিহাদ ফরযে-আইন না হয়ে ফরযে-কিফায়াহ্ হবে।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস

করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বললো, জী, বেঁচে আছেন। তখন রসূল (সা) তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কিফায়াহ্। যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ -

—অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়!"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেদেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মোহাদ্দিস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কিফায়াহ্।

মাস'আলা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে কিফায়াহ্ পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কিফায়াহ্তে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, "যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয় কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী

মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে ঃ

خویش رادیدم دررسوائے خویش

---"অনেক সময় নিজেকে আত্ম-অবমাননায় নিয়োজিত দেখেছি।" কাজেই বলা হয়েছে---জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্‌কদ্, জিলহজ্জ এবং মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা - منها اربعة حرم ذلك الدين القيم এবং বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে হুযুর (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ منها اربعة حرم ثلاث متوالیات ورجب এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ্ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিত-কারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছে ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ -

حيث শব্দটি এ স্থলে কালবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সা)-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশ'আরী (রা)-কে আউতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ফকীহ্‌গণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন। জাস্‌সাস বলেছেন ঃ وهو قول فقهاء الامصار অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ফকীহ্‌গণেরই সম্মিলিত অভিমত।

রূহুল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরায়ে বরা'আতের প্রথম রুকুর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'এজমায়ে উম্মতে'র কথা উল্লেখ করেছেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয় 'আয়াতুস-সাইফ' অর্থাৎ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ -

পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযুর (সা)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রসূল (সা)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মনসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফিররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফিররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও জায়েয। যেমন, ইমাম জাস্‌সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রসূল (সা) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত না হবেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম ঃ উল্লিখিত আয়াত–يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে।

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থাৎ 'তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বা ইহ ও পরকালে বরবাদ হয়ে গেছে।' এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যদি তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয় তাহলে

সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মিরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চির-কালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাস'আলা ঃ যদি এ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়, তবে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্জ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা দ্বিতীয়বার হজ্জকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দুটি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাস'আলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

أسلمت على ما أسلفت من خير-হাদীসটি এ অর্থেই এসেছে।

মাস'আলা ঃ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা হতেও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফিরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

(২১৯) তারা তোমাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চদশ আদেশ ঃ শরাব ও জুয়া সম্পর্কে ঃ মানুষ আপনার কাছে শরাব ও জুয়া

সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন এ দুটি (বস্তুর ব্যবহার)-এর মধ্যে মহাপাপের বিষয় (সৃষ্টি হয়) এবং এতে মানুষের (কিছু) উপকারিতাও রয়েছে তবে পাপের বিষয়গুলো সেই উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশী (কাজেই উভয়টিই পরিত্যাজ্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্যও বিধানগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান ঃ ইসলামের প্রথম যুগে জাহিলিয়ত আমলের সাধারণ রীতিনীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখনও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধির বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তাঁরা যান না। এ ব্যাপারে নবী-করীম (সা)-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তু হতেও তাঁর অন্তরে পূর্ব থেকেই একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা, স্পর্শও করেন নি।

মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে-আযম, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়; এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত, যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া হতে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এ দুটির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সে সব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ, যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে ধাবিত করে বলে একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) সাহাবীগণের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আহারের পর প্রথা অনুযায়ী মদ্যপানের ব্যবস্থা করলেন এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে আগে বাড়িয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান হতে বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। ইরশাদ হল ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ -

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেও না।' এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল। পরবর্তীতে বহু সংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বঞ্চিত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক (রা) কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাঁদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ-এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ (রা) রসূল (সা)-এর দরবারে

উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযুর (সা) দোয়া করলেন ঃ

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি লাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?"

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ ঃ আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে ঃ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا— "আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।" এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। মদ্যপান হারাম করা হয়নি, বরং

এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসা'য় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى—এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্য-পানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে গেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত।

আলেমগণ বলেছেন ঃ نظام العادة اشد من نظام الرضاعة অর্থাৎ 'যেভাবে শিশুদেরকে মাতৃস্তনের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ত্যাগ করা এর চাইতেও কষ্টকর।" এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সবশেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই একে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমত ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধ-তার আইন-কানুন শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এ জন্য রসূল (সা) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ "সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, "শরাব ও ঈমান একত্র হতে পারে না।" তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) হুযুর (সা)-এর নিকট হতে বর্ননা করেছেন যে, হুযুর (সা) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে—এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লানত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হন নি, বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ ঃ আদেশ পাওয়ামাত্র অনুগত সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসূল করীম (সা)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে---হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করেছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্র কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল, যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালন-কল্পে সাহাবীগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্র করেছিলেন।

হুযুর (সা) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই যখন মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছলো তখন সেই সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল, যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুযুরে আকরাম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সা) হুকুম করলেন, মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্যসম্ভার স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মো'জেযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণিত হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায় সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর একটি মাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তাঁরা শরাবের প্রতি ততটুকুই ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যতটুকু পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য ঃ আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনা-সমূহের মধ্যে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মো'জেযা বা নবী করীম (সা)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য পরিণতিও বলা যেতে পারে। বস্তুত নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘন্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি গরশ পাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হল! সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হয়ে গেল!

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজ সংস্কারকগণ মদ্যপানের সংখ্যাতীত মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের সে আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাস করা হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে তা হল এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমন কি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি, বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যার ফলে রসূল (সা)-এর একটিমাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল; তারপর প্রণয়ন করা হল আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের

নিকট সব কিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙখলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা ঃ এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান---কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা ও অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফিকাহ্‌র কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে ---শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন—যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধ মানুষের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগটি মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদ্যপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মারও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞানবুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়, যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের

দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে থাকে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর। সুতরাং কোরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ -

অর্থাৎ "শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।"

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়, যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়, বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে ধাবিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যিনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ার পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত অথবা আল্লাহ্‌র কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন-করীমে

ইরশাদ হয়েছে ঃ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوٰ অর্থাৎ শরাব তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়—একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হল শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সা) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ঃ ام الفواحش وم الخبا ئث অর্থাৎ "শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।" এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।---(তফসীরে আল-মানার ঃ মুফতী আবদুহু---পৃঃ ২২৬, জিঃ ২)

আল্লামা তানতাবী (র) স্বীয় গ্রন্থ আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ্ ফিল ইসলাম'-এ লিখেছেন, "প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানকে খতম করার জন্য নিমিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন, "ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তির বিধান করা দরকার।"

সারকথা, যে কোন সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন ঃ "এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী

কাজ, এ যে হলাহল---ধ্বংসের উপকরণ ! এই 'উম্মুল-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো না ; ফিরে এসো-- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহ্লের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয় ; যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটা-মুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

অর্থাৎ আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক ; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।

তফসীর ও ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সমস্ত নেয়া-মতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُسْقِيكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দু'রকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয় ; দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থাৎ খজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে ?

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলীল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'আলার দানসমূহ এবং তার

ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র নেয়ামত। যথা ঃ সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ---কোন্ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্ পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীত 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসির নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুক্‌র' (سكر) বলেছেন।---(রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী, জাস্‌সাস)

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।--- (জাস্‌সাস ও কুরতুবী)

জুয়ার অবৈধতা ঃ ميسر একটি ধাতু। এর আভিধানিক অর্থ বন্টন করা। ياسر বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহিলিয়ত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হত। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর মাংস দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হত; নিজেরা ব্যবহার করতো না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দান-শীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশ গ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগা বলে মনে করা হত। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মায়সার' বলা হত। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ী এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মায়সার' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে এবং জাস্‌সাস 'আহ্‌কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন যে, মুফাস্‌সিরে কোর-আন হযরত ইবনে-আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদাহ্, মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ্, আতা ও তাউস (রা) বলেছেন ঃ

الميسر القمار حتى لعب الصبيان بالكعب والجوز-

অর্থাৎ সব রকমের জুয়াই 'মায়সার' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ المخاطرة من القمار "লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।" জাস্‌সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন ঃ যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মায়সারের অন্তর্ভুক্ত। ---(রূহুল-বয়ান)

مخاطرة --'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মায়সার ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত নির্ভর করে, যাতে মালিক হওয়া-না-হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। ---(শামী, পৃঃ ৩৫৫, ৫ম খণ্ড)

উদাহরণত এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মায়সার, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ী স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মায়সার-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এতে যদি কোন চাঁদা নেওয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত।

এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বারীদা (রা)-র উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের মাংস ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রা) বলেছেন---ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন --দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা থেকেও খারাপ। -----(ইবনে-কাসীর)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রোমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কিস্‌রার কাছে পরাজিত হয়েছে, তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর (রা) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীগণ জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করে দিতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীগণ জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযুর (সা) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকা কালেও স্বীয় রসূল (সা)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রসূল (সা)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। হুযুর (সা) জাফর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন—আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ্ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন, তখন বলতেই হয়। তা হচ্ছে এই—আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভালমন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহিলিয়ত আমলেও আমি কোনদিন মূর্তি পূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রম-বোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যিনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনদিনও মিথ্যা কথা বলিনি।—(রূহুল-বয়ান)

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি ঃ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও আছে, কিন্তু উপকার লাভের চাইতে এর ক্ষতি অনেক বেশী ; এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম মানুষই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃ-পতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পথ এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয় পক্ষের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মায়সার' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চারজনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি

প্রকার শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে। অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ার মধ্যে বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া থেকে অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ

كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ—অর্থাৎ সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ـ

অর্থাৎ শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।

এমনিভাবে জুয়ার আর একটি অনিবার্য ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, মানুষ শরাবের ন্যায় জুয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বেখবর হয়ে

পড়ে। আর এজন্যই কোরআনে শরাব ও জুয়ার কথা একই স্থানে একই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতি গোপনভাবে জুয়ায়ও একটি নেশা হয়, যা মানুষকে ভাল-মন্দ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আলোচ্য আয়াতেও এ দু'টি বস্তুকে একত্রে বর্ণনা করে এ ক্ষতির কথাই বলা হয়েছে যে, এটা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

জুয়ার আর একটি নীতিগত ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এ অবৈধ পথে অন্যের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করার একটি পন্থা। এতে কোন উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত অন্য ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। এসব পন্থাকেও কোরআনে-করীম এভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ---অর্থাৎ "মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভোগ করো না।" জুয়ার আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, হঠাৎ ক্ষণিকের মধ্যে গোটা একটা পরিবার ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। লক্ষপতি ফকীর হয়ে যায় এবং গোটা পরিবার বিপদের সম্মুখীন হয়। পরোক্ষভাবে এতে সমগ্র জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, যারা সেই হেরে যাওয়া ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা দেখে তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাকে ঋণ-কর্জ দিত, এখন সে দেউলিয়া হওয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবে এবং ঋণ আদায় করতে অক্ষম হবে, সুতরাং সকলের উপরই এর প্রতিক্রিয়া হবে।

জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের কর্মক্ষমতাকে শিথিল করে দেয় এবং মানুষ কাল্পনিক উপার্জনের পথ বেছে নেয়। আর সর্বদা এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে যে, অন্যের উপার্জিত সম্পদে কিভাবে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেবে।

এ সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, জুয়া সমগ্র জাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোরআন ঘোষণা করেছে إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا—অর্থাৎ শরাব ও জুয়ার ক্ষতি উপকার থেকেও অধিক।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ও কায়দা ঃ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্তুতেও কিছু-না-কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু-না-কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলোকে ক্ষতিকর বলা হয় এবং এসব থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও

হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যিনা-প্রতারণা এমন কি ব্যাপার আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা, কিছু-না-কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বোঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু-না-কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এসবকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে। কেননা, এগুলোর মধ্যে উপকারের চাইতে দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতিই বেশী।

ফিকাহ্‌র আর একটি আইন ঃ এ আয়াতের দ্বারা এও বোঝা গেল যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ কোন একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, যা ক্ষতি বহন করে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ
اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

(২১৯) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে—কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার, (২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। (২২১) আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম; যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহবান করে; আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ষোড়শ নির্দেশ ঃ দানের পরিমাণ ঃ এবং মানুষ আপনার কাছে দান সম্পর্কে জানতে চায় যে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন—যা সহজ হয়, (যা খরচ করলে পেরেশান হয়ে দুনিয়াতে কষ্টে পড়তে হবে বা অন্যের অধিকার নষ্ট করে পরকালের ক্ষতিতে পতিত হতে হবে, এ পরিমাণ নয়।) আল্লাহ্ তা'আলা এমনি-ভাবে নির্দেশসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এ সম্পর্কে অবগত হতে পার এবং এ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিটি আমল করার পূর্বে) দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে (সে সব আদেশ সম্পর্কে) চিন্তা কর। (এবং চিন্তা করে প্রতিটি ব্যাপারে সে আদেশমত আমল করতে পার)।

সপ্তদশ নির্দেশ ঃ এতীমের মালের সংমিশ্রণ ঃ (যেহেতু প্রাথমিক যুগে সাধারণত এতীমের হক সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না, তাই এখানে ভীতি-প্রদর্শন করা হয়েছে যে, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা দোযখের অগ্নিশিখা নিজের পেটে ভর্তি করারই নামান্তর। এ বাণী যাঁরা শুনলেন, তাঁরা ভয়ে এমনই সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করলেন যে, পরিবারস্থ এতীমদের খাদ্যও আলাদা পাক করতেন এবং আলাদাভাবে রাখতেন। আর যদি সেই এতীম শিশু আহার কম করতো এবং আহার্য অবশিষ্ট থাকতো তবে সে খাবার নষ্ট হয়ে যেতো।। কেননা, সে খাদ্য তাঁরা নিজেরা ব্যবহার

করাও জায়েয মনে করতেন না। এতীমের মাল সদকা করারও অনুমতি ছিল না। এভাবে তাদেরও কষ্ট হতো, এতীমেরও ক্ষতি হতো। তাই শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি হুযুর (সা)-এর দরবারে পেশ করা হলো। এ সম্পর্কেই আয়াতে এর ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে)---এবং মানুষ আপনার নিকট এতীম শিশুদের (ব্যয় আলাদা বা একত্রে রাখার) ব্যাপারে জানতে চাইবে। আপনি বলে দিন যে, (তাদের মাল খাওয়া নিষেধ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সম্পদ যেন নষ্ট করা না হয়। আর যদি ব্যয় যৌথ রাখলে তাদের মঙ্গল হয়, তবে) তাদের মঙ্গলের খেয়াল করা (খরচ ভিন্ন রাখলে যদি তাদের অমঙ্গল হয়) অতি উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে খরচ যৌথ রাখ, তবুও ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, সে (ক্ষেত্রে) তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই। আর ভাই ভাই তো একত্রেই থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বার্থ নষ্টকারীকে এবং সুবিধা রক্ষাকারীকে (ভিন্ন ভিন্ন) জানেন। (কাজেই আহার্যে একত্রিকরণ এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এতীমের ক্ষতি হয়। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কমবেশী হলে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিয়ত সম্পর্কে অবগত, তাই এতে শাস্তি হবে না।) আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে (এ সম্পর্কে কঠোর আইন জারি করে) তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন। (কেননা) আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী (কিন্তু সহজ আইন এজন্য জারি করেছেন যে, তিনি) হেকমতওয়ালাও বটে। (এমন আদেশ তিনি দেন না, যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়)।

অষ্টাদশ আদেশ ঃ কাফিরদের সাথে বিয়ে ঃ এবং মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কাফির নারীকে বিবাহ করো না এবং মুসলমান নারী (চাই) বাঁদীই (হোক না কেন, সে) কাফির নারী অপেক্ষা (শতগুণে) উত্তম (চাই সে স্বাধীনই হোক না কেন); যদি সে কাফির (মেয়ে মাল-দৌলত বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তোমার নিকট ভাল মনে হয়, তবুও বাস্তবে মুসলমান নারী তার চাইতে উত্তম এবং এমনিভাবে নিজের অধীনস্থ মুসলমান) নারীকে কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হয় এবং মুসলমান পুরুষ (সে) যদি ক্রীতদাস (ও হয়, তবু শতগুণে) উত্তম কাফির পুরুষ হতে (সে চাই স্বাধীনই হোক না কেন,) যদিও সে কাফির ব্যক্তি (মাল-দৌলত ও মান-সম্মানে) তোমাদের নিকট ভাল মনে হয়। (কিন্তু তবুও বাস্তবে মুসলমানই তার চাইতে ভাল। কারণ, সে কাফির নিকৃষ্ট হওয়ার কারণেই এর সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। এসব (কাফির) মানুষ দোযখে (যাওয়ার) ইন্ধন যোগায়। (কেননা, তারা কুফরীর আন্দোলন করে; আর এর পরিণাম দোযখ।) আর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত এবং ক্ষমার (অর্জনের) পথ দেখান। নিজের আদেশে (এবং সে আদেশের বিস্তার এভাবে হয়েছে যে, কাফিরদের সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন, তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। তা হলেই তাদের আন্দোলনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যাবে এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থেকে বেহেশত এবং মাগফেরাত লাভ করা যাবে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য স্বীয় হুকুম বলে দেন, যাতে তারা তাঁর উপদেশমত আমল করে (এবং বেহেশত ও মাগফেরাতের অধিকারী হয়)।

বয়ানুল কোরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ মাস'আলা ঃ যে জাতিকে তাদের

প্রথাপদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহ্‌লে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খৃস্টান বা নাসারা মনে করে; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও স্বীকার করে না, ঈসা (আ)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহ্‌লে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

মাস'আলা ঃ এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফির পুরুষদের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফির স্ত্রী পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকে জড়িয়ে পড়ে, যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন ঃ

প্রথমত 'মুশরিক' শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কোর-আন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়ত মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণটি তো আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত মুসলমানদের বেলায়ই খাটে, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে ঃ তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরেক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযুর (সা)-কে রসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়ত কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলে তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোন অনিময় বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থত বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ স্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থ বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফির না হয়ে যায়!

পঞ্চমত কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযুর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলমান বিবাহের জন্য দ্বীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি আদেশ জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ।---(কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ)

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে-দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারুকের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষত বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খৃস্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতই ধর্ম বিবর্জিত। তারা ঈসা (আ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলা বাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিশেষত وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ

أُوتُوا الْكِتَابَ —আয়াতে যাদের বোঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসাবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

(২২২) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হায়েয বা ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাসের অবৈধতা এবং পবিত্রতার শর্তসমূহ ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ..... وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ এবং মানুষ আপনার নিকট হায়েয (অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসের বিষয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তা (হায়েয)

অপবিত্রতার বস্তু। সুতরাং হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (সহবাস থেকে) বিরত থাক এবং (এ অবস্থায়) তাদের সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ না তারা (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যায়। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায় (অপবিত্রতার সন্দেহ না থাকে,) তখন তার কাছে এস। (তার সাথে সহবাস কর) যে স্থান দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দান করেছেন (অর্থাৎ সামনে দিয়ে।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তওবাকারীদেরকে (অর্থাৎ ঘটনাচক্রে অথবা অসতর্ক মুহূর্তে হায়েয অবস্থায় সহবাস করে ফেললে পরে অনুতপ্ত হয়ে যারা তওবা করে) এবং যারা পাক-পবিত্র ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসেন। (হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্রাবস্থায় সঙ্গমের অনুমতি দান, আবার সামনের রাস্তায় এ জন্য যে,) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য জমিনতুল্য। (যাতে শুক্র বীজস্বরূপ এবং সন্তান তার ফসলতুল্য) সুতরাং স্বীয় জমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার কর। (যেভাবে জমি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীগণকে পবিত্রাবস্থায় সর্বভাবে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে) এবং আগত দিনের জন্য কিছু (নেক আমল সঞ্চয়) করতে থাক এবং আল্লাহ্কে (সর্বাবস্থায়) ভয় করতে থাক। আর এ বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে নীত হবে এবং (হে মুহাম্মদ [সা]! এ জন্য) ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে (যারা নেক কাজ করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আল্লাহ্র নিকট উপনীত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে) সুসংবাদ দিয়ে দিন (যে, পরকালে তারা বিভিন্ন রকমের নেয়ামত পাবে)।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا
وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন, জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আল্লাহ্র নামকে (নিজেদের কসমের দ্বারা) সেসব কাজের যবনিকায় পরিণত করো না যে, তোমরা নেকী ও পরহেযগারী এবং মানুষের মধ্যে সংশোধনের কাজ করবে না। (আল্লাহ্র নামে শপথ এমন করবে না যে, আমি নেক কাজ করবো না) এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শুনেন ও জানেন। (সুতরাং কথা বলতে সাবধানে বল এবং অন্তরে মন্দ চিন্তার স্থান দিও না)।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝۲۲۵

(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শপথের জন্য প্রশ্ন করবেন না, তবে সে সব মিথ্যা শপথের জন্য যাতে তোমাদের অন্তর মিথ্যা বলার ইচ্ছা করছে (এসব বেহুদা শপথের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন)। এবং তিনি ধৈর্যশীল ক্ষমাকারী (যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথকারীকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দান করেন)।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۲۲۶ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۲۲۷

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি মিলমিশ্ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ঈলার হুকুম ঃ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ থেকে سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ পর্যন্ত। অর্থাৎ) যারা (কোন সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশী সময়ের জন্য) নিজেদের স্ত্রীগমন ব্যাপারে শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং যদি (চার মাসের মধ্যে) এরা (নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবর্তন

করে, তাহলে তো বিয়ে যথারীতি বজায় থাকবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা (এমন ধরনের কসম ভঙ্গ করার পাপ কাফফারার মাধ্যমে) ক্ষমা করে দেবেন (এবং যেহেতু এ সময় স্ত্রীর হকসমূহ আদায়ে ব্যস্ত হবে, সেহেতু তার প্রতি) রহ্মতও করবেন। আর যদি স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করারই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়ে থাকে (এবং সে জন্যই চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়,) তখন (চার মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার তালাক হয়ে যাবে। আর) আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কসমও) শুনেন (আর তাদের দৃঢ় সংকল্পও) জানেন (আর সেজন্যই এ ব্যাপারে যথার্থ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে)।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এবং প্রত্যাহারের সময়সীমার বর্ণনা ঃ وَالْمُطَلَّقٰتُ ..... يَتَرَبَّصْنَ ..... اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা (যাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকবে যে, তাদের সাথে তাদের স্বামী সহাবস্থান কিংবা সহবাস করে থাকবে, তাদের ঋতুস্রাব হয়ে থাকবে, তারা স্বাধীন হবে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত

বিধান অনুযায়ী তারা ক্রীতদাসী হবে না)। নিজেকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) বিরত রাখবে তিন ঋতু (শেষ হওয়া) পর্যন্ত। (একেই বলা হয় ইদ্দত)। আর এসব স্ত্রীর পক্ষে একথা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ যা কিছু তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করে থাকবেন (তা গর্ভই হোক অথবা ঋতুস্রাব) সেগুলোকে গোপন করবে---(কারণ, এসব বিষয় গোপন করতে গেলে ইদ্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে)। যদি সেসব স্ত্রী আল্লাহ্ এবং আখেরাতের বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়। (এ কারণে যে, এ বিশ্বাসের তাগাদা হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রতি ভীত থাকা যে, নাফরমানীর ফলে না জানি আবার শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়)। আর যে স্ত্রীদের স্বামীগণ (তাদের সে তালাক যদি 'রাজঈ' হয়ে থাকে---যার আলোচনা পরে করা হবে---পুনর্বিবাহ ছাড়াই) তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার সংরক্ষণ করে (অবশ্য তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে। আর এ ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাহারকেই 'রাজ'আত বলা হয়)। তার শর্ত হচ্ছে যে, (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে) সংশোধনের উদ্দেশ্য রাখবে। (আর জ্বালাতন করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্য রাজ'আত করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অবশ্য তাতে রাজ'আত বা প্রত্যাহার কার্যত হয়ে যাবে)। আর (সংশোধনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে,) স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে (পুরুষদের উপর) যেমন (ওয়াজিব হিসাবে) তাদেরই অধিকারের অনুরূপ, সেই স্ত্রীদের উপর পুরুষদের রয়েছে (যা শরীয়তের রীতি অনুযায়ী পালন করতে হবে)। আর (এটুকু কথা অবশ্যই আছে যে,) তাদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা সামান্য বেশী (তার কারণ, তাদের অধিকারের প্রকৃতি স্ত্রীদের অধিকারের প্রকৃতির তুলনায় কিছুটা অগ্রবর্তী)। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী (শাসক), মহাজ্ঞানী।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাস'আলা ঃ (১) চরম যৌন উত্তেজনাবশত ঋতু-কালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্যকর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান-খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

(২) পশ্চাৎ পথে (অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) 'লাগভ্-কসম'-এর দু'টি অর্থ---একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণামত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত---নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এরকম,---এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ্' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গমূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানিফা (র)-র মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগভ্' কসমের জন্যও কোন কাফ্ফারা নেই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগভ'-এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্' (অহেতুক) এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি —'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে ঃ

প্রথমত, কোন সময় নির্ধারণ করলো না।

দ্বিতীয়ত, চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো।

তৃতীয়ত, চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা

চতুর্থত, চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো। বস্তুত ১ম, ২য় ও ৩য় দিক-গুলোকে শরীয়তে 'ঈলা' বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাত্য়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে অর্থাৎ পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথভাবে অটুট থাকবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ —আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসাবে গণ্য। এ আয়াতে পূর্বাপর কয়েকটি রুকূতে এ মূলনীতিরই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ঃ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বান্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যপন্থী জীবন-ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশী করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং তার উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ যথার্থ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফল লাভ হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে ইসলামের সমাজব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ যথাস্থানে আলোচনা হবে। তবে এ বিষয়ে আমার প্রণীত 'তাক্‌সীমে-দৌলত' বইটিও প্রয়োজনীয় ইশারা-ইঙ্গিতের জন্য কাজে লাগতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে—নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থিত হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ○

অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্‌ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়ত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাব-পত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বিক্রয় করা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না ; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য

জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার কোনই অধিকার ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হল অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নাই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে বৈধ জ্ঞান করা হতো। বরং এ কাজটিকে একজন পিতার পক্ষে একান্ত সম্মানজনক এবং কৌলীন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো। মহানবী (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খৃস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাস করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

'হযরত রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চক্ষু খুলে দিয়েছে---মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিবাহ-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামী মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও

শরীয়তে-মোহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেত্না-ফাসাদের মূল কারণ ঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়, ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গা-হীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وللرجال عليهن درجة অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়তের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহিলিয়তের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেত্না-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে ঃ

اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে যে, যে নারীকে এক সময় তারা মানুষ বলে গণ্য করতেও রাযী ছিল না, সেই জাতিগুলিই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেত্না দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস হতে ফেত্না-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই।

যদি আজ ফেত্না-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড়

বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আত্ম-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রসূল (সা)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথ-ভাবে পালন করার পথনির্দেশ করা হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবার জন্যও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে চায় অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য ঃ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভা-বিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেওয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা الرجال قوامون على النساء আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদা লাভ করার যোগ্য।

কোরআনে শরীয়তের নির্দেশ এবং কর্মফলের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বর্ণনায় যদিও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা অন্য আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তথাপি সাধারণভাবে পুরুষকে সম্বোধন করেই সব কথা বলা হয়েছে এবং সম্বোধনের ভাষায় পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অবশ্য শুধু কোর-আনের বেলায়ই নয়, বরং অন্যান্য আইনের বেলায়ও সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অথচ আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যে পার্থক্যের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক প্রকার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হয়ত এই যে, স্ত্রীলোকের বর্ণনাতেও গোপনীয়তা রক্ষা করার দরকার। কিন্তু কোরআনের স্থানে স্থানে পুরুষের মত স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করাতেই হযরত উম্মে সালমা (রা) হুযুর (সা)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখনই সূরা আহ্যাবের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ

وَالْقٰنِتٰتِ এতে পুরুষদের সাথে সাথে স্ত্রীলোকদের কথাও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ, বেহেশতে স্থান লাভ ইত্যাদিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নাসায়ী, মসনদে-আহমদ, তফসীরে ইবনে জরীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বর্ণনা রয়েছে।

তফসীরে ইবনে কাসীরের এক বর্ণনাতে আছে যে, জনৈক মুসলমান স্ত্রীলোক রসূল (সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে প্রশ্ন করেন—কোরআনের স্থানে স্থানে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের তো কোন উল্লেখ নেই ? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মোটকথা দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্ত্রীলোকের নিরাপত্তার জন্য পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরকালের শুভাশুভ কর্মফলের বেলায় কোন পার্থক্য নেই। কোরআনের অন্যত্র এ ব্যাপারটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যথা ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ

অর্থাৎ 'যে পুরুষ ও স্ত্রী ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করব।'

উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। ইরশাদ হয়েছে ঃ لهن مثل الذى عليهن —অর্থাৎ তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে। এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা সাধারণত তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। এস্থলে مثل শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এস্থলে লক্ষণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে ভরে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে।—(বাহ্‌রে-মুহীত) এ বাক্যটি শেষে بالمعروف -শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয়, যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ীও যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ীও কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা—বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু—با لمعرو ف শব্দটি দ্বারা এই সব ব্যাপারই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وللرجال عليهن د رجة -এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ —বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ
يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ
يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

(২২৯) তালাকে-'রাজঈ' হ'ল দুবার পর্যন্ত—তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে! কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নাই। এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তারাই হলো জালেম। (২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তালাক দু'বারে দিতে হয়। অতঃপর (দু'বার তালাক দেওয়ার পর দু'টি অধিকার রয়েছে—) ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে নিয়ে নিয়মানুযায়ী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করবে, অথবা (ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিতে দেবে এবং এভাবে) ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেবে এবং (তালাক দানকালে) স্ত্রীর কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় (যদিও গৃহীত সে বস্তু মোহরের বিনিময়ে দেওয়া বস্তু থেকেও হয়ে থাকে। তবে এক অবস্থায় গ্রহণ করা জায়েয।

তা হচ্ছে এই যে,) যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন দাঁড়িয়ে যায়, যাতে উভয়েরই ভয় হয় যে, (এ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে (অর্থ-সম্পদের আদান-প্রদানে) উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ হবে না। স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে (তবে এ সম্পদের পরিমাণ মোহরের চাইতে বেশী হতে পারবে না)। এসবই আল্লাহ্র বিধান। (তোমরা) এর সীমালংঘন করো না। আর যারা এ সীমা অতিক্রম করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে।

অতঃপর যদি (দু'তালাকের পরে) তৃতীয় তালাকও দিয়ে বসে, তবে সে স্ত্রী-লোক তৃতীয় তালাকের পর, অন্যত্র বিয়ে করার পূর্বে সে ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না। (তবে দ্বিতীয় বিয়েও ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর করতে পারবে।) এবং (দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করার পর) যদি সে কোন কারণে তালাক দিয়ে দেয় (এবং ইদ্দত শেষ হয়ে যায়) তখন তারা পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে তারা পাপী হবে না। যদি তাদের এ আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তারা এতে আল্লাহ্র আদেশ যথা-যথভাবে পালন করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য তাঁর এ কানুন বর্ণনা করে থাকেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝাতে হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাকঃ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি মাত্র। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিবাহ সাধারণ লেনদেন ও চুক্তির ঊর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রাখা হয় না।

প্রথমত যে-কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে-কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত বিয়ে ব্যতীত অন্য সব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদন-কালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয় পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও

না করে, তবুও শরীয়তের বিধান মতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তত দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব-কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হল, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্ত ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন গাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনুল-করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا — আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায়

এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে ; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার হতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ ابغض الحلال الى الله الطلاق- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- অর্থাৎ যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিবাহের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয় পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া

পর্যন্ত বিবাহের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না।

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিবাহই অক্ষুণ্ণ থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এ জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিবাহ করতে চায় তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ — অর্থাৎ তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুত ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিক-ভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী) মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবী করে বসে। কোরআন মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।"

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাস'আলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا —এ আয়াতে এরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

তিন তালাক ও তার বিধান ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড়জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে; তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ-এর পর তৃতীয় তালাককে فَإِنْ ((যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে--- طلقها এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, الطلاق ثلث অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ্ তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেন নি। তাঁরা একে তালাকে-বিদ'আত বলেন। আর অন্য ফকীহ্গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেন নি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা। বরং বিদ'আত তালাক-এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক

দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ একে আহ্‌সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম নাখ্‌য়ী (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে مرتان শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে! الطلاق طلاقان-এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مرتان শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া।—(রূহুল -মা'আনী)

যা হোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহ্‌গণ একে সুন্নত তরীকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বোঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে আকরাম (সা)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবীদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله. (نسائى كتاب الطلاق - ج ٢ صفحة ٩٨)

অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিয়েছে—এ সংবাদ রসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি! এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। (যাদুল-মা'আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ এ হাদীসের সনদকে সহীহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহ তৃতীয় তালাককে নাজায়েয ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমাম তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়াকে

সুন্নত তরীকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে---প্রথমত তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশত যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরো অসুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালমন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দুটি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায় অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দুটি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ فامساك بمعروف اوتسريح باحسان এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিলে-মহব্বতের সাথে সংসার জীবন-যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই تسريح باحسان বলা হয়েছে। تسريح অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র) আবূ রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলে-করীম (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন مرتان——বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تسريح باحسان বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক। ——(রূহুল-মা'আনী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্মপদ্ধতিও তাই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে امساك -এর সাথে بمعروف শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক; তেমনিভাবে تسريح —এর সাথে احسان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ-বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায় তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; ইহ্সান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপ-ঢৌকন ও কাপড়-পোশাক দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত-প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাতছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন ঃ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয় তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয় অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ-বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুযুর (সা)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাককে কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্র করেছেন। সম্প্রতি জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল-আসার' গ্রন্থে এ মাস'আলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'-তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

মাহমুদ ইবনে লাবীদের ঘটনা সম্পর্কে নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়াতে হুযুর (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমন কি কোন কোন সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে হুযুর (সা) ঘোষণা করেছেন—এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না।

পরবর্তী বর্ণনা যা সামনে আসছে তাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত উয়াইমেরের এক সাথে তিন তালাক দেওয়াকে অত্যন্ত না-পছন্দ করা সত্ত্বেও হুযুর (সা) তা কার্যকর করেছেন। এমনিভাবে আলোচ্য হাদীসে মাহমুদ ইবনে লাবীদ সম্পর্কে কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী এ বাক্যটিতে লিখেছেন যে, হুযুর (সা) তার এ তিন তালাকও কার্যকর করেছেন। হাদীসের বাক্য এরূপ ঃ

فلم يرده النبى صلى الله عليه وسلم بل امضاه كما فى
حديث عويمر العجلانى فى اللعان حيث امضى طلاقه الثلاث
ولم يرده - (تهذيب سنن ابى داؤد)-

দ্বিতীয় হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى
الله عليه وسلم اتحل للاول قال النبى (صعلم) لا حتى يذوق عسيلتها
كما ذاقها الاول - (صحيح بخارى ج ٢ ص ٧٩١ صحيح مسلم ص ٤٦٣)-

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করেছে এবং সেও তালাক দিয়েছে। তখন হুযুর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ

স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য কি হালাল হবে? তিনি উত্তর দিলেন---না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়।" হাদীসের শব্দে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই তিনটি তালাকই একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ফত্হল-বারী, ওমদাতুল-ক্বারী, কোসতুলানী প্রমুখ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ঘটনায় তিন তালাক একই সাথে দেওয়া হয়েছিল এবং হাদীসে এর মীমাংসাও রয়েছে যে, রসূল (সা) এ তিন তালাক কার্যকর করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে করে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলেও প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না। তৃতীয় ঘটনাটি হযরত উয়াইমের (রা)-এর। তিনি হুযুর আকরাম (সা)-এর সামনে নিজের স্ত্রীর প্রতি খেয়ানতের অভিযোগ আরোপ করে 'লিআন' করলেন এবং অতঃপর আরয করলেন ঃ

فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره النبى صلى الله عليه وسلم-(صحيح بخارى مع فتح البارى ص ٣٠١ ج ٩ صحيح مسلم ص ٢٨٩ ج ١)-

---অতঃপর যখন দু'জনই লিআন করে নিলেন তখন উয়াইমের বললেন---ইয়া-রসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি তার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হব, যদি আমি তাকে আমার নিকট রেখে দিই। তখন উয়াইমের (রা) তাকে রসূলের আদেশের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দিলেন। আবুযর এ ঘটনাকে হযরত সা'দ ইবনে সহল-এর যবানে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ

فانفذه رسول الله (صلعم) وكان ما صنع عند رسول الله (صلعم) سنة قال سعد حضرت هذا عند رسول الله (صلعم) فمضت السنة بعد فى المتلا عنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا - (ابوداؤد ص ٣٠٦ - طبع اصح المطابع)-

অর্থাৎ রসূল (সা) এটি কার্যকর করেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে যা সংঘটিত হয়েছে, তা সুন্নত বলে গৃহীত হয়েছে। হযরত সা'দ বলেছেন, এ ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এরপর থেকে লিআনকারীদেরকে ভিন্ন করে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে আর কোন দিন তারা একত্রিত হতে পারবে না।

এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উয়াইমেরের একসঙ্গে প্রদত্ত এ তিন তালাককে তিন গণ্য করেই রসূল করীম (সা) তা কার্যকর করেছেন।

মাহমুদ ইবনে লাবীদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় ও আবুবকর ইবনে আরাবীর বর্ণনানুযায়ী একত্রে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে কার্যকর করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তা যদি নাও হতো তবু কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিন তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাকরূপে গণ্য করে স্ত্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা আলোচ্য তিনটি হাদীসেই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদিও একত্রে তিন তালাক প্রদান রসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, কিন্তু উক্ত তিন তালাককে তিনি তিন তালাকরূপেই গণ্য করেছেন।

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ঘটনা ঃ পূর্ববর্তী বিবরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাকরূপে গণ্য করা রসূল (সা)-এরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত যে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله (صلعم) وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم فامضاه عليهم - (صحيح مسلم ج ١ ص ٤٧٧)-

অর্থাৎ "হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সা)-এর যুগে, হযরত আবুবকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর তিন তালাককে এক তালাক রূপেই গণ্য করা হতো। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, মানুষ এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, যাতে তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছিল। তাই তা কার্যকর করাই উত্তম। তখন তিনি তা কার্যকর করে দিলেন।" ফারুকে-আ'যমের এ নির্দেশ ফকীহ্ সাহাবীগণের পরামর্শে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হয়; এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। এজন্য হাফেযে-হাদীস ইমাম ইবনে আবদুল বার মালেকী (র) এ বিষয়ে ইজমার কথাও উল্লেখ করেছেন ঃ যুরকানী ও শরহে-মোয়াত্তায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافة لا يلتفت اليه - (زرقانى شرح مؤطا ص ١٦٧ ج ٣)-

অর্থাৎ অধিকাংশ ওলামায়ে উম্মত একই সঙ্গে প্রদত্ত তালাক হুবহু কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে একমত। বরং ইবনে আবদুল বার্‌র এর উপর ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এর বিরুদ্ধে নগণ্যসংখ্যক লোক রয়েছে, যা ভ্রূক্ষেপের যোগ্য নয়।

শায়খুল-ইসলাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

قال الشافعى ومالك وابو حنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاؤس وبعض اهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة - (شرح مسلم ص ٤٧٨ ج ١)-

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই হবে। তবে তাউস প্রমুখ কোন কোন আহ্‌লে-যাহের বলেছেন যে, এতে এক তালাক হবে।

ইমাম তাহাভী শরহে-মাআনিল-আসারে বলেছেন ঃ

فخاطب عمر (رض) بذالك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله صلعم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك فى زمن رسول الله صلعم فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع - (شرح معانى الاثار ص ٢٩ ج ٢)-

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা) এ প্রসঙ্গে সকল স্তরের জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যাদের মধ্যে এমন সব সাহাবীও ছিলেন, যাঁরা নবী-যুগের তরীকা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু তাদের কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন নি অথবা তা খণ্ডনও করেন নি।

আলোচ্য ঘটনাটিতে যদিও সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে উম্মতের জন্য নীতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়া যদিও নিকৃষ্টতম পন্থা এবং রসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ বলে প্রমাণিত, কিন্তু তথাপি যদি কোন ব্যক্তি এ ভুল পন্থায় তালাক দেয় তাহলে তার স্ত্রী হারাম হয়েই যাবে। এবং অন্যত্র বিয়ে করে পুনরায় তালাকপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে পুনর্বিবাহ হতে পারবে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এখানে দুটি প্রশ্ন উঠে। প্রথমত এই যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় বহু হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে হুযুর (সা) কার্যকর করেছেন, এর প্রত্যাহার বা পুনর্বিবাহের অনুমতি দেন নি। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ কি যে, রসূল (সা)-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং ফারুকে আযমের খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করা হতো এবং হযরত ফারূকে-আযমই তিন তালাক হিসাবে এর মীমাংসা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যদি এ ঘটনা মেনেও নেওয়া হয় যে, রসূল (সা)-এর যুগে এবং আবু-বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে তিন তালাককে এক তালাক ধরে নেওয়া হতো, তবে ফারূকে-আযম (রা) এরূপ একটা পরিবর্তন কি করে করলেন? আর যদি একথা মনে করা না হয় যে, এতে তিনি ভুলই করেছেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে, অন্যান্য সাহাবী কি করে এ মীমাংসা মেনে নিয়েছিলেন?

প্রশ্ন দু'টির উত্তর দিতে গিয়ে মুহাদ্দেসীন ও ফকীহ্গণ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে ইমাম নবভী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে উত্তরটিকে সবচাইতে সঠিক বলে উদ্ধৃত করেছেন এবং যা অত্যন্ত পরিষ্কার তা এই যে, ওমর ফারূক (রা)-এর এ মীমাংসা এবং তার প্রতি সাহাবীগণের অনুমোদন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বলে যে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম; অথবা বলে যে, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম; ---এ অবস্থার দুটি অর্থ হতে পারে---হয়তো সে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তা বলে থাকবে অথবা শুধু তাকীদ করার

উদ্দেশ্যে তিনবার বলে থাকবে; তিন তালাকের উদ্দেশ্যে নয়। নিয়তের ব্যাপার তো সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতে পারে। হুযুর (সা)-এর যুগে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রভাব ছিল বেশী। এমন শব্দ বলার পর যদি কেউ বলতো যে, আমার তিন তালাকের নিয়ত ছিল না, মাত্র তাকীদের জন্য শব্দটি বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে, তবে তিনি তার শপথকৃত বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিতেন এবং তাকে এক তালাকই ধরে নেওয়া হতো।

এর প্রমাণ হযরত রুকানা (রা)-র হাদীস দ্বারা হয়। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে "البتة" শব্দ সহযোগে তালাক দিয়েছিল। আর এ শব্দটি আরবের প্রচলিত নিয়মে তিন তালাকের জন্যই বলা হতো। কিন্তু এর অর্থ পরিষ্কার 'তিন' ছিল না এবং হযরত রুকানা (রা) বলেছেন যে, এতে আমার নিয়ত তিন তালাক ছিল না; বরং এক তালাক দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। রসূল (সা) তাকে কসম দিলে সে তাতে কসমও করেছে। তখন তিনি তাকে এক তালাকই ধরে নেন। এ হাদীস তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন শব্দ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন কোন ভাষ্যে অবশ্য এ-কথা বলা হয়েছে যে, হযরত রুকানা (রা) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আবু দাউদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত রুকানা البتة—শব্দ সহকারে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন; এ শব্দ যেহেতু তিন তালাকের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো, এজন্য কোন কোন বর্ণনাকারী একে তিন তালাক বলেই উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, এ হাদীস দ্বারা সবার ঐকমত্যে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রুকানার তালাককে হুযুর (সা) তখনই এক তালাক বলে গণ্য করেছেন, যখন তিনি কসম করে বর্ণনা করেছেন যে, এতে আমার উদ্দেশ্য তিন তালাক ছিল না। আরো প্রমাণ হয় যে, তিনি পরিষ্কার ভাষায় তিন তালাক বলেন নি, নতুবা তিন-এর নিয়তের প্রশ্নই উঠতো না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রয়োজন ছিল না।

এ ঘটনা একথা পরিষ্কার করে দেয় যে, যে সব শব্দ তিন তালাকের নিয়ত করা হয়েছিল, না এক তালাকের নিয়ত বর্তমান ছিল—একথা সুস্পষ্ট করে দেয় না; সেস্থলে তিনি শপথের মাধ্যমে মীমাংসা প্রদান করেন। কেননা, সেই যুগ ছিল সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার যুগ। কেউ মিথ্যা শপথ করবে, তা ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রা) অনুভব করলেন যে, দিন দিন সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার অবনতি ঘটছে এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অপরদিকে এরূপ ঘটনার আধিক্য দেখা দিয়েছে যে, 'তালাক' শব্দ তিনবার বলেও অনেকে এক তালাকের নিয়তের কথা বলছে। ফলে এতে অনুভব করা যাচ্ছিল যে, এমনিভাবে যদি তালাকদাতার নিয়তের

সত্যতা মেনে নেওয়া হয়, তবে অদূরভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে শরীয়ত-প্রদত্ত এ সুবিধার যথেচ্ছ ব্যবহারও অসম্ভব নয়। এমন কি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণেরও সূচনা করতে পারে। অতএব, হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর বিচক্ষণতা ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে যেহেতু সবাই অবগত ছিলেন, তাই তখন সবাই একবাক্যে তাঁর এ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দান করলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা রসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, হুযুর (সা) যদি এ যুগে বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও অন্তরের নিয়ত ও ব্যক্তির বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিতেন না। কাজেই আইন করে দেওয়া হলো যে, এখন থেকে যে ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক দেবে, তাহলে তা তিন তালাক রূপেই গণ্য হবে। সে যদি শপথ গ্রহণ করে থাকে যে, আমার নিয়ত ছিল এক তালাক, তবুও তার এ শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত ফারূকে-আযম (রা) উক্ত বিষয় সম্পর্কে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলোও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন ঃ

ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم -

অর্থাৎ "এমন এক ব্যাপারে মানুষ তাড়াহুড়া করতে আরম্ভ করেছে, যাতে তাদের জন্য সময় ও সুযোগ ছিল। সুতরাং তাদের উপর তা কার্যকর করাই শ্রেয়।"

একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাকরূপেই গণ্য হবে; এক তালাক নয়। হযরত ওমর ফারূক (রা) কর্তৃক জারিকৃত এ ফরমান এবং তৎপ্রতি সাহাবীগণের ঐকমত্য সম্পর্কিত যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এর সমর্থন হাদীসের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। এতদসঙ্গে সে প্রশ্নটিরও মীমাংসা হয়ে যায় যে, হাদীসের বর্ণনায় যেখানে খোদ হুযুর (সা) কর্তৃক একসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকরূপেই গণ্য করে তা কার্যকর করার একাধিক ঘটনা প্রমাণিত রয়েছে, সেখানে হযরত ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা যে রসূল (সা)-এর যমানায় একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককেও এক তালাকরূপেই গণ্য করা হতো---কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে।

এ প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, রসূল (সা)-এর যমানায় 'তিন' শব্দের দ্বারা তিন তালাকের নিয়তে একসঙ্গে যেসব তালাক দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে তিন তালাকই গণ্য করা হতো। অপর পক্ষে তিন তিনবার বলার পরও এক তালাক গণ্য হতো শুধুমাত্র সে সমস্ত ঘটনায়, যেগুলোতে তিন তালাকই দেওয়া হয়েছে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া যেতো না, বরং এক তালাকের নিয়তেই তাকীদের জন্য 'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণের দাবী করা হতো।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় যে, একসঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করার একাধিক ঘটনায় রসূল (সা) কর্তৃক এক তালাক গণ্য করার পরও হযরত ওমর (রা) তাঁর ব্যতিক্রমী বিধান কিসের ভিত্তিতে জারি করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামই বা সে বিধান কেন মেনে নিয়েছিলেন? বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় হযরত ওমর ফারূক (রা) রসূল (সা) কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার রোধ করারই কার্যকর

পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র রসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেন নি। বস্তুত এরূপ চিন্তাও করা যায় না।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ
عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

(২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত

ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে আর সে ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাকে নিয়মানুযায়ী (প্রত্যাহার করে) বিয়ে অবস্থায় থাকতে দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাকে বিদায় করে দাও। আর তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। এমন উদ্দেশ্য (করো না) যে, তার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করবে। আর যে ব্যক্তি এমন করবে, সে বাস্তবে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। আর আল্লাহ্র বিধানকে খেলায় পরিণত করো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তা স্মরণ কর এবং বিশেষ করে কিতাব ও হেকমতের বিষয়গুলো যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি (এই উদ্দেশ্যে) নাযিল করেছেন যে, তদ্দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করবেন। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত ভালভাবে অবগত। তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্বাচিত) স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে বাধা দেবে না, যখন তারা নিয়মানুযায়ী পরস্পর রাযী হয়। এ ব্যাপারে যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে, এ উপদেশ গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতা ও অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল) ভালভাবে জানেন অথচ তোমরা তা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনা সহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াত-গুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ঃ প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بالمعروف শব্দটি দু'জায়গায়ই

পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশী বা আবেগের তাকীদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা) তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন এবং পরস্পর অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এজন্য আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا—অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

দ্বিতীয় নিয়মটি সূরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ—

مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ অর্থাৎ পরস্পরের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে নাও, যাতে সাক্ষীর প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে সাক্ষ্যদান করে। অর্থাৎ যখন 'রাজ'আত' বা প্রত্যাহারের ইচ্ছা কর, তখন দু'জন নির্ভরযোগ্য মুসলমানকে সাক্ষী রাখ। এতে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে—এক হচ্ছে এই যে, স্ত্রী পক্ষ থেকে যদি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কোন দাবী থাকে, তবে সে সাক্ষীর দ্বারা তা নিষ্পত্তি করা যাবে।

দ্বিতীয়ত, নিজের উপরও মানুষের নির্ভর করা উচিত নয়। যদি প্রত্যাহার প্রক্রিয়ায় সাক্ষী নিযুক্ত করা না হয়, তবে এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও শয়তানী উদ্দেশ্যে দাবী করতে পারে যে, আমি ইদ্দতের মধ্যেই তালাক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম।

এসব দুষ্কর্মের প্রতিরোধকল্পেই কোরআন এ নিয়ম প্রবর্তন করেছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে।

বিষয়টির দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সময় দেওয়া এবং চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি অন্তরের কালিমা দূর না হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে এতে মনের ক্রোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে ব্যাপারটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমিত না থেকে

দু'টি পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে দিতে পারে। কাজেই সে আশংকার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোরআন সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছে ঃ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ছেড়ে দেওয়া বা সম্পর্ক ছিন্ন করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তাও নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এ নিয়মের কিছু বর্ণনা কোরআন-মজীদে রয়েছে এবং অবশিষ্ট বিশদ বিবরণ হাদীসের মাধ্যমে রসূল (সা) দিয়ে গেছেন।

যেমন, এর পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ—وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا শরীয়ত বিষয়ক অসুবিধা ছাড়া তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا থেকে নিজের দেয়া মাল-সামান কিংবা মোহরানা ফেরত নিও না কিংবা অন্য কোন বিনিময় দাবী করো না।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- অর্থাৎ "সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কিছু উপকার করা নিয়মানুযায়ী স্থির করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের উপর।" এ উপকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিদায়কালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপহার-উপঢৌকন, নগদ কিছু অর্থ অথবা ন্যূনপক্ষে একজোড়া কাপড় প্রদান করা এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার যা তালাকদাতা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হিসাবে রয়েছে এবং কিছু সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হিসাবে আরোপ করা হয়েছে, যা বলিষ্ঠ চরিত্র এবং সুসভ্য সামাজিকতারই পবিত্র শিক্ষা। আর এতে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে বিয়ে একটি পারিবারিক চুক্তি, অনুরূপভাবে তালাকও একটি সম্পর্কের সমাপ্তি। এই সম্পর্কচ্ছেদকে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের উৎসে পরিণত করার কোন প্রয়োজনই নেই। সম্পর্কচ্ছেদও ভদ্রোচিত উপায়ে হওয়া উচিত, যাতে তালাকের পর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কিছু উপকার হতে পারে।

এই উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলোতে স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে রেখে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে এবং তখনও স্ত্রীর মোহর আদায় করা না হয়ে থাকলে এবং তার সাথে সহবাস করা হয়ে থাকলে তাকে পূর্ণ মোহর দিয়ে দিতে হবে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে এবং এরই মধ্যে তালাক দেওয়ার উপক্রম হয়ে থাকে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দিতে হবে; এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব। তা আদায় করতেই হবে। আর বিদায়কালে সহানুভূতিস্বরূপ তাকে কিছু নগদ টাকা অথবা ন্যূনতম পক্ষে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেওয়া বলিষ্ঠ